ভাষা সংগ্রাম ঃ
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

স্মরণিকা

জাতীয় চেতনা পরিষদ

৭ ফাল্গুন, ১৯ ফেব্রুআরি-২০০২

ভাষা সংগ্রাম ঃ
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

স্মরণিকা

জাতীয় চেতনা পরিষদ

৭ ফাল্গুন, ১৯ ফেব্রুআরি-২০০২

www.pathagar.com

সম্পাদক ঃ

শামসুল হক বসুনিয়া

সহ সম্পাদক ঃ

মোঃ অহিদুজ্জামান

প্রকাশনায়ঃ

জাতীয় চেতনা পরিষদ

৪৯৮/৪, বাগানবাড়ি, মালিবাগ-ঢাকা

ফোনঃ ৯৩৩৮০৮৯

প্রকাশকাল ঃ

১৯, ফেব্রুআরি -২০০২ইং

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ ঃ

কোবা এ্যাডভারটাইজিং

ফোনঃ ৯৩৩৫৯২৫

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়

আমাদের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হল। বীরত্ব গাঁথা এই গৌরবের দিনটি বছর ঘুরে আমাদের দ্বারে একবার কড়াঘাত করে স্মরণ করিয়ে দেয় – অধিকার কেড়ে নিতে হয়। সহজ ভাবে পাওয়া যায় না।

মাতৃভাষা মানুষের মৌলিক অধিকার। মায়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত এই স্নেহ, আদর মাখা বুলির সংগে আমাদের হৃদয়ের উষ্ণ আবেগ জড়িত। মা, মাতৃভাষা এবং মাটির সাথে রয়েছে মানুষের নিবিড় ভালবাসা। এগুলি আমাদের অস্তিত্বের প্রতীক এবং মৌলিক অধিকার। এ অধিকার কেড়ে নেয়া কিংবা জোর করে চাপিয়ে দেয়া কোন সুশীল সভ্য সমাজবদ্ধ মানুষের কাম্য হতে পারে না। আমাদের বুকে আন্তর্জাতিক একটি মহল জগদ্দল পাথরের মত বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দুকে চাপাতে চেয়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটে আমাদের বীর সন্তানদের সোচ্চার প্রতিবাদকালে ইতিহাসের পাতায় এক দুঃখজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়। আমাদের জাতীয় জীবনে সৃষ্টি হয় বেদনায় ভরা একটি স্মরণিয় দিন। অপর দিকে এই ভাষা সংগ্রামের সিঁড়ি বেয়ে আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এসেছে। কিন্তু আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে প্রাপ্তি কতটুকু সে প্রশ্নের অবকাশ রয়ে গেছে। এবং যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময় আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই সৎসাহসী সন্তানদের আত্মত্যাগের মূল্যায়ন আমরা কতটুকু করতে পেরেছি (?) এ প্রশ্নের উত্তর দিতে লজ্জাবনত হতে হয়। প্রসংগত বলতে হয়, আমাদের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসকে কতিপয় দুর্মুখেরা চাপা দিয়ে সত্য এবং বিশ্বাসকে হত্যা করতে সদা উৎকণ্ঠিত।

এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় চেতনা পরিষদ ভাষা সংগ্রামের সত্য ইতিহাসকে দেশ, জাতি এবং নতুন প্রজন্মের কাছে প্রকাশ করতে এক মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ভাষা আন্দোলনের সত্য, বস্তুনিষ্ঠ এবং বাস্তব ইতিহাসকে তুলে ধরাই আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়। যে জাতি নিজের সত্য ইতিহাস জানে না, সে জাতি কখনোই উন্নতীর উচ্চশিখরে পৌঁছতে পারে না। অতএব আমাদের জাতীয় জীবনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সত্যকে উদঘাটন এবং যথার্থ মূল্যায়ন করাই হোক আমাদের জাতীয় চেতনা।

www.pathagar.com

ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ ঃ

একুশে পদক প্রাপ্ত ভাষা সৈনিক কাজী গোলাম মাহবুবের সাক্ষাৎকার

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখনও এমন একজন বেঁচে আছেন যিনি ১৯৪৩ সালের মহা দুর্যোগ ও দুর্ভিক্ষের কালে রাস্তায় পড়ে থাকা এক অনাহারী মৃত মায়ের শুষ্ক স্তন চোষা শিশুর আর্তনাদ শুনে রাজনীতিতে নেমেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী এই মহান রাজনীতিবিদ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান ও মহান মুক্তিযুদ্ধে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যে ১৪ জন রাজনৈতিক ব্যক্তি ঐতিহাসিক ২১ দফা ইস্তেহার প্রণয়ন করেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র জীবিত এই ব্যক্তিত্বের নাম কাজী গোলাম মাহবুব।

২০০২ সালে একুশে পদক প্রাপ্ত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি এডভোকেট কাজী গোলাম মাহবুব ১৯৫২ সালে সংঘটিত ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে জাতীয় চেতনা পরিষদ-এর উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারের স্মরণীকার জন্য প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে খোলামেলা ভাবে বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুআরি হঠাৎ করে আকাশ থেকে পাকিস্তানের মাটিতে আবির্ভূত হয়নি। এর জন্য সুদীর্ঘ কালের প্রয়াস ও প্রেক্ষাপট তৈরী করতে হয়েছিল। ১৯৪৭ সাল থেকেই এর প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার ঘটনা ও মেডিকেল কলেজের সামনে গোলাগুলির সূত্রপাত হয়। তিনি বলেছেন, জেল, জুলুম, হুলিয়া, নির্যাতন ভোগ করলাম আমরা, আর ভাষা সৈনিক হয়ে গেলেন অন্যরা।

ভাষা আন্দোলনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট কি ছিল জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা ছিলাম শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত এক নির্যাতিত জাতি। আমরা ছিলাম এ উপমহাদেশের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ জাতি। ১৯৪৭ সালে আমাদের সংগ্রামের ও মুক্তির ফসল হল পাকিস্তান। এই আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সাথে আন্দোলনের পেছনের যে সমস্ত ঘটনা আমি দেখেছি সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অভিভূত করেছে আমাকে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ। মানুষ না খেয়ে কঙ্কালসার হয়ে কিভাবে মৃত্যুবরণ করেছে, স্বচক্ষে সেই করুণ দৃশ্য আমি দেখেছি। হাড্ডিসার শিশুকে মৃত মায়ের বুকের উপর পড়ে থাকতে দেখেছি। রাস্তায় কুকুর, কাক আর মানুষ একই ডাস্টবিন থেকে খাবার কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে, এ দৃশ্যগুলো এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে। এ ঘটনাগুলো আমার জীবনে গভীর রেখাপাত করেছে। মানুষ

www.pathagar.com

না খেয়ে তিলে তিলে মরছে। কেউ তাকে খাবার দিচ্ছে না, এর চেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা, দুঃখজনক ঘটনা আর কি হতে পারে। আর এদেশের মানুষ চোখের সামনে কাড়ি কাড়ি খাবার দেখেও তা লুটপাট করে খায়নি। এমন ভাল মানুষের দেশ আর কোথায় থাকতে পারে? একদল মানুষের হাতে অঢেল খাবার আর এক দল মানুষ অনাহারী, অথচ তারা লুট করে খায় না, এমন ভাল মানুষ আমি পৃথিবীর কোথাও দেখিনি।

ছোট বেলা থেকে আর একটা জিনিষ আমার জীবনে মারাত্মক রেখাপাত করেছে। সেটি হল এক শ্রেণীর মানুষের একে অণের ঘৃণা ও অবজ্ঞা। হিন্দু জমিদার ও বিত্তশালীরা কি ভাবে মুসলমানদের ঘৃণা করত, কত নিকৃষ্ট ভাবত তা আমি দেখেছি। হিন্দু বাড়ীর ঘরে কুকুর ঢুকলে কোন ক্ষতি হত না, অথচ যদি কোন মুসলমান ঢুকত, তাহলে তারা ঘরের সকল আসবাব-হাড়ি-পাতিল বাহিরে ফেলে দিত। নতুন করে ধুয়ে মুছে তারপর তা ব্যবহার করত। হিন্দুদের সব কাজকর্ম মুসলমানরাই করে দিত। ফসলাদি ফলাত। আর তারা এদেশে বসে মুসলমানদের কষ্টার্জিত সম্পদ ভোগ করত। অথচ মুসলমানরা হিন্দু জমিদারদের বাড়ির সামনে দিয়ে জুতা পায়ে আর ছাতি মাথায় দিয়ে হাঁটতে পারতো না। এই দেশের মুসলমানরা বৃটিশ বেনিয়াদের দ্বারা যতটুকু শোষিত হয়েছে তাঁর চেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছে হিন্দুদের দ্বারা। হিন্দু-বৃটিশ এই উভয় গ্রুপের দ্বারা মুসলমানরা সমভাবেই নিগৃহীত হয়েছে। অথচ এই দেশকে বৃটিশ মুক্ত করতে স্বাধীনতার জন্য মুসলমানরা বার বার বিদ্রোহ করেছে, যুদ্ধ করেছে, আন্দোলন করেছে, অকাতরে জীবন দিয়েছে। ফলে বৃটিশরা কোনদিনও মুসলমানদের বিশ্বাস করেনি। হিন্দুরা এই সুযোগ নিয়ে বৃটিশদের তাঁবেদারি করেছে। এই দেশে হিন্দুরা বৃটিশদের সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছে। রাজনৈতিক ভাবে হিন্দুরা সব সময়ই মুসলমানদের বিরোধিতা করত। বঙ্গ ভঙ্গের সময় হিন্দুদের আসল চেহারা প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথও তাঁর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি কখনই ভারতীয় হিন্দুত্বের আচরণ থেকে বের হয়ে আসতে পারেননি। শুধুমাত্র লেখা ছাড়া তাঁর কোথাও বাঙালিত্বের ছাপ দেখা যেত না। তিনি ছিলেন সবসময়ের জন্য হিন্দু জমিদারদের পক্ষে। কাজেই আমাদের আন্দোলন ছিল হিন্দু ও বৃটিশ উভয়ের বিরুদ্ধে। পাকিস্তান আন্দোলন করেছি এদেশের গণ মানুষের, বিশেষ করে মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে আর পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর যে আন্দোলন করেছি তার পুরোটাই ছিল এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য।

প্রশ্ন ঃ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুআরি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত কতটুকু সঠিক ছিল বলে আপনি মনে করেন?

www.pathagar.com

কাজী গোলাম মাহবুবঃ এটি একটি মূল্যবান প্রশ্ন। আন্দোলন হঠাৎ করে হয়ে যাওয়ার জিনিস নয়। আন্দোলনের একটা গতিধারা আছে। আমরা ১৯৫২ সালের ৩০ শে জানুআরি চূড়ান্ত পর্যায়ের এই আন্দোলন শুরু করি। আমাদের এ আন্দোলনের সাথে তখনকার সময়ের সকল বড় বড় ব্যক্তিরা জড়িত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম, আতাউর রহমান খান, শামসুল হক সাহেব সহ বেশ কয়েকজন এমএলএ এবং মাওলানা আকরাম খাঁ প্রমূখ চিন্তাশীল নেতৃবৃন্দ। আমরা ছিলাম এঁদের পেছনে পেছনে। এ সকল মহৎ মানুষেরা দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য, মানুষের দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্য কি করেছে তা আমি দেখেছি। তাঁদের অতি সান্নিধ্যে থেকে ভাষা আন্দোলনের মত এমন একটি বড় আন্দোলন আমি করতে পেরেছি, এতে আমি নিজেকে অহংকারী ভাবিনা, তবে গৌরব বোধ করি। এ প্রসংগে একটি কথা স্পষ্ট করেই বলতে হয় যে, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুআরি ছিল আমাদের ডাকা ধর্মঘটের দিন। আমরা সকল প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। আমাদের প্রস্তুতি ছিল সারা দেশে। দেশব্যাপী ধর্মঘট পালনের জন্য জেলায় জেলায় লোক পাঠিয়ে আমরা মনিটরিং করেছি। ১৪৪ ধারা জারি করা হয় আগের দিন সন্ধ্যায়। তখন আন্দোলনের প্রস্তুতি আমাদের সম্পন্ন। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মঘট পালিত হবে, অথচ সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেছে। তাই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের মিটিং ডাকা হল নবাবপুর রোডের অফিসে। এটা ছিল তখন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিস, সামসুল হক সাহেব সেক্রেটারী। এখানে মিটিং ডাকলাম সব দলের নেতাদের নিয়ে। সব জায়গা থেকে লোক এসেছে। আমাদের মিটিং চলে রাত ৮টা থেকে রাত সাড়ে ১২টা পর্যন্ত। মিটিংয়ে সকল ধরনের বক্তব্য এসেছে কিভাবে আন্দোলন এগিয়ে নেয়া যায়। সব দলের অধিকাংশ নেতাই ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার পক্ষে মত দিয়ে বক্তব্য দিলেন এবং সিদ্ধান্ত হল আগামীকাল ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা হবেনা। এর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির কিছু কর্মী ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার জন্য পেছন থেকে জোরে জোরে বলছিল। এরা ছাড়া দুই-একজন ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার প্রস্তাব দেয়। তাঁদের মধ্যে প্রধানত অলি আহাদ সাহেব ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার প্রস্তাব দেন। তিনি জীবন ভরই তাঁর ইগো বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। আর মেডিকেল কলেজের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন গোলাম মওলা সাহেব। তিনিও ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে বক্তব্য দেন। আমরা তখন বক্তব্য দিলাম যে, এ ধরনের জঙ্গী আন্দোলনে গেলে এতদিনের গড়ে ওঠা আন্দোলন নসাৎ হয়ে যেতে পারে। আমরা গ্রেফতার হলে আন্দোলন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আমাদের বিকল্প তৈরী না করে আমরা এভাবে এগুবোনা। এ প্রসংগে আবুল হাশিম সাহেব 'কুইট ইন্ডিয়া' আন্দোলনের উদাহরণ পেশ করে বলেন, ১৯৪২ সালে কংগ্রেস কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলন অহিংস ভাবে শুরু করলেও মীর্জাপুর সহ কয়েকটি জায়গায় ব্যাপক সহিংসতা হওয়ায় কংগ্রেস

www.pathagar.com

তাৎক্ষণিকভাবে তা উইথ-ড্র করে নেয়। এ ব্যাপারটি আবুল হাশিম সাহেব তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে মিটিং এ আলোচনা করেন। তিনি আরো বলেন, আন্দোলন ঘোষণা করা বড় ব্যাপার নয়, তা সুচারুরূপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হল বড় ব্যাপার। সবশেষে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা হবে না সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্ত নেবার সময় আমাদের খবর দেয়া হয় যে, ফজলুল হক হলের কিছু ছাত্র ১৪৪ ধারা ভাংগার পরিকল্পনা করছে। আমরা সারা রাতই অফিসে ছিলাম। আমাদের ধারণা হয়েছিল যে, কেউ কেউ হয়ত আমাদের আন্দোলনকে স্যাবোটাজ করতে পারে, কারণ আমরা ছিলাম নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। এর পর আবুল হাশিম সাহেবের সাথে পরামর্শক্রমে আমাকে এবং শামসুল হক সাহেবকে সকালে সেখানে পাঠানো হয়। গিয়ে দেখি কিছু ছাত্র ১৪৪ ধারা ভাংগার উদ্যোগ নিচ্ছেন। সামসুল হক সাহেব তখন তাদের বুঝিয়ে বললেন, দেখ অলটারনেটিভ কিছু চিন্তা না করে এভাবে তৈরী আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে নেয়া ঠিক নয়। সেখানেও কমিটির পক্ষ থেকে আমিও বক্তৃতা করলাম। এর মধ্যে গাজীউল হক সাহেব আসলেন, উনি মিটিংয়ে প্রিজাইড করলেন। মিটিংটির স্থায়িত্ব ছিল সর্বোচ্চ ২৫ থেকে ৩০ মিনিট। এর পর ছাত্ররা যাতে আইনী প্যাচে না পড়ে তাই দলবদ্ধ না হয়ে ৪ জন ৪জন করে রাস্তায় বেরুতে থাকল। পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে ছেড়ে দিল। কাউকে তেজগাঁও, কাউকে যাত্রাবাড়ী, এমনি ভাবে। এরপর পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছোড়ে। গাজীউল হক সাহেব শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা দিতেও পারেননি। তিনি ঢাকা ছেড়ে চলে যান। গাজীউল হক সাহেবকে আর খুঁজে পাওয়া গেলনা। আমরা হাসপাতাল সহ বহু জায়গায় খোঁজ করলাম। কিন্তু তাঁকে আর পাওয়া গেল না। খবর বেরুল টিয়ারগ্যাসের সেল লেগে গাজীউল হক মারা গেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হল গায়েবী জানাযাও হল। শাহেদ আলী সাহেব এর উদ্যোক্তা ছিলেন। বিকেলে এসেম্বলী ছিল। ছাত্রদের মিলনস্থল ছিল মেডিকেল কলেজ চত্তর। সেখান থেকে ফের উত্তেজনা হতে পারে ভেবে সরকার বিপুল সংখ্যাক পুলিশ মোতায়েন করে। বিপুল পুলিশের সমাগম দেখে ছাত্রদের মধ্যেও উত্তেজনা দেখা দেয় এবং এর এক পর্যায়ে সেখানে গুলী হয়। এই ঘটনার সাথে সকাল বেলার ১৪৪ ধারা ভাংগার ঘটনা সম্পূর্ণ পৃথক। ১৪৪ ধারা ভাংগার জন্য গাজীউল হক কৃতিত্ব দাবী করেন, কিন্তু রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন এবং বিকেলে বর্তমান শহীদ মিনারের কাছে গোলাগুলীর ঘটনা দু'টি পৃথক ঘটনা। বিগত সরকার আমলেও এক ধরনের বিভ্রান্তির অপচেষ্টা আরো বেশি করে করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ ভাষা আন্দোলনের বিতর্কিত ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ভাষা আন্দোলনের মত মহান আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকার বিষয়টি জোর করে প্রচার করা হয়েছে।

সাক্ষাতকার গ্রহণেঃ মোঃ ওবায়দুর রহমান শাহীন

www.pathagar.com

এক নজরে ভাষা আন্দোলন
আব্দুল গফুর

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি আমাদের মনে নিঃসন্দেহে আনন্দের সৃষ্টি করে। বিশেষ করে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অভ্যুদয় সত্যিই গৌরবের। বাংলা ভাষার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে আমাদের গৌরবময় ভাষা আন্দোলনের কথা দেশ, জাতিকে এবং নতুন প্রজন্মকে জানতে সহায়তা করবে। নতুন প্রজন্মের কাছে সঠিক ও সত্য ইতিহাসকে উপস্থাপন করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস না জেনে কোন জাতি উন্নতির স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করতে পারে না। সম্ভবও নয়। আমাদের স্বাধীন সত্তার পিছনে রয়েছে অনেক আত্মত্যাগ। আমাদের এই ত্যাগের মহিমায় স্বাধীনতার ইতিহাস হয়েছে অনন্য এবং উজ্জ্বল। তার মধ্যে ভাষা আন্দোলন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের এই আত্মোৎসর্গের সত্যকে মিথ্যার আস্ফালনে একটি গোষ্ঠী ঢেকে দিতে চায়। ইতোমধ্যে কালিমা লেপন করেছে জাতিসত্তার এই মহান ইতিহাসকে। কিন্তু আমরা যারা ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রাণপণ ছিলাম এবং আন্দোলনকে সফলভাবে বিজয়ী করেছি, আমরা ঐ গোষ্ঠীর মিথ্যাচারে লজ্জিত। অতএব আমাদের উচিৎ নতুন প্রজন্মের কাছে সঠিক, বস্তুনিষ্ঠ এবং সত্য ইতিহাসকে তুলে ধরা।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। উনিশ'শ চুয়াল্লিশ থেকে আটচল্লিশ পর্যন্ত উন্মেষ পর্ব। আটচল্লিশ থেকে বায়ান্ন পর্যন্ত সংগ্রাম পর্ব এবং বায়ান্ন থেকে ছাপ্পান্ন পর্যন্ত বিজয় পর্ব। ভাষা আন্দোলনের সূচনা চুয়াল্লিশ থেকে। এ বিবেচনার পেছনে যুক্তি এই যে, উনিশ'শ চুয়াল্লিশই ভারত বিভাগ ভিত্তিক স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা পাকিস্তান আন্দোলন তদানীন্তন অবিভক্ত বঙ্গে একটা প্রবল গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। ফলে ভাবী স্বাধীন রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার প্রচলন সম্পর্কে বাস্তব চিন্তা-ভাবনা শুরু করা তখন সম্ভব হয়ে ওঠে। যা ভারত বিভাগের সম্ভাবনা অনিবার্য বিবেচিত না হলে সম্ভবপর হত না। উনিশ'শ তেতাল্লিশ সালে বিপ্লবী চিন্তাবিদ ও সংগঠক জনাব আব্দুল হাশিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর এবং তাঁর সহযোগীদের এক বছরের

www.pathagar.com

অক্লান্ত সাধনা ও সংগ্রামের ফলে উনিশ'শ চুয়াল্লিশেই বাংলাদেশে পাকিস্তান আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য রূপ পরিগ্রহ করে। যেমনটি অবিভক্ত ভারতবর্ষের অন্য কোন অঞ্চলেই দেখা যায়নি।

উনিশ'শ ছাপ্পান্ন সালে পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদে বাংলা ভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করে। সেই হিসেবে ভাষা আন্দোলন আনুষ্ঠানিক সাফল্যজনক সমাপ্তি উনিশ'শ ছাপ্পান্ন সালে হয়েছে বলে ধরা হলেও ভাষা আন্দোলনের লক্ষ্য অদ্যাবধি পূর্ণরূপে বাস্তাবায়িত হয়েছে কিনা এ প্রশ্ন তুলবার অবকাশ রয়ে গেছে। আর তা রয়ে গেছে বলেই অনেকে ভাষা আন্দোলন এখনও শেষ হয়নি বলে মনে করেন। অপরদিকে ভাষা আন্দোলনের সূচনাপর্বও হঠাৎ করে রাতারাতি আসেনি। প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবীর কোন বড় ঘটনাই হঠাৎ করে ঘটে না।

বহুদিন, বহুবছর, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে যুগ ও বহু শতাব্দী ধরে কোন বড় ঘটনার পটভূমি রচিত হতে থাকে। ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। ভাষা আন্দোলনের নিকট অতীত পটভূমি অবশ্যই ছিল উনিশ'শ চল্লিশের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব। ভারত বিভাগ এবং উপমহাদেশের উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাসমূহ নিয়ে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবি না উঠলে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবি উত্থাপনের পথ প্রশস্ত হত না। তবে লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে ভারত বিভাগের এ দাবি ওঠার সঙ্গত কারণও থাকত না, ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন না ঘটলে এবং বিশেষত উপমহাদেশের বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিপুল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা সৃষ্টি না হলে।

প্রকৃত প্রস্তাবে সপ্তম শতাব্দিতে হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর খিলাফতের যুগে বাংলায় আগত প্রথম ইসলাম প্রচারক থেকে শুরু করে সমস্ত ইসলাম প্রচারকই এদেশে এসে এখানকার জনগণের মুখের ভাষা শিখে নিয়ে তার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করেন। তের শতকে এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত এদেশে সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দোর্দণ্ড প্রতাপের মুখে বাংলা ভাষা চর্চাকারীরা অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় ছিলেন। মুসলিম বিজয়ের পর প্রধানত বাংলা ও আরাকানের মুসলিম সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতাই যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দ্রুত উন্নতি শুরু হয় এ এক ঐতিহাসিক সত্য। এদেশে ইসলামের আগমন ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর দ্রুত প্রসারের মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দ্রুত বিকাশের এই পটভূমিতে এ সত্য অনস্বীকার্য। ভাষা

www.pathagar.com

আন্দোলনের এমন কি আজকের বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘমেয়াদী পটভূমি রচনার মূলে এদেশে ইসলামের আগমন এক ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

উনিশ'শ চল্লিশের নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনে ভারত বিভাগের যে প্রস্তাব গৃহীত হয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তার গুরুত্ব অপরীসীম। উপমাহাদেশে বহু শতাব্দীর ঐতিহাসিক বাস্তবতার এই প্রস্তাবে প্রস্তাবিত হয়। উনিশ'শ সাত চল্লিশের মধ্যে উপমহাদেশের নেতৃবৃন্দ এর বাস্তবতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন। বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তায় বিশ্বাসী যে কোন ব্যক্তিকে আজও এ প্রস্তাবের বাস্তবতার মধ্যেই আমাদের স্বাধীন জাতিসত্তার স্বীকৃতির সন্ধান করতে হবে। যা হোক, এই লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার দুই বছরের মধ্যেই কোলকাতা ও ঢাকায় যথাক্রমে পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি ও পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ নামে দু'টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই দু'টি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন আলোচনা সভা এবং এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত লেখকদের প্রকাশনা প্রভৃতির মাধ্যমে অনাগত পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপরেখা আলোচিত হতে থাকে। এ প্রসঙ্গেই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি পাকিস্তান আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নও এসে পড়ে। অখণ্ড ভারতপন্থীদের হিন্দু প্রীতির মোকাবেলায় উপমহাদেশীয় প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানপন্থীদের মধ্যে উর্দুর প্রতি একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা থাকলেও পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে, জাতীয় সাহিত্যের ও শিক্ষার বাহন হিসেবে এঁদের খুব কম জনই বাংলার পরিবর্তে উর্দু ভাষার কথা কল্পনা করেছেন। তবে হ্যাঁ, এ রকম উদ্ভট চিন্তা দু'একজন করতো এবং তাঁদের বিরুদ্ধে এই সংস্থাদ্বয়ের সদস্য ও লেখকদের সমালোচনা থাকত বলিষ্ঠ ও দ্ব্যর্থহীন।

১৯৪৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের যে সম্মেলন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত হয় সেখানে সংসদের সভাপতি সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের বাহন বাংলা ভাষা হবে এ প্রশ্ন বহু পূর্বেই চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হয়ে গেছে। এতদিন পরে উর্দু-বাংলা প্রশ্নের উত্থাপন করা পণ্ডশ্রম ও হাস্যকর বলেই বিবেচিত হবে। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মুসলমানের কাছে উর্দু বিদেশী সমতুল্য। (মাসিক মোহাম্মদী, ফাল্গুন -১৩৪৯)। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলিগড় মুসলিম

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ স্বাধীন ভারতে হিন্দির মোকাবেলায় পাকিস্তানে একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দিলে বাংলাদেশের খ্যাতনামা পণ্ডিত ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। পাকিস্তানের সমস্যা সম্বন্ধে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র একটি রচনা ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসের ২৯ তারিখে দৈনিক আজাদে প্রকাশিত হয়। এ সময় ভাষা প্রশ্নে আজাদ পত্রিকায় বেশ কিছু রচনা প্রকাশিত হয়। এভাবে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে যখন বিতর্কের সূচনা হয় তখন মাসিক 'সওগাত' এ প্রকাশিত হয় কবি ফররুখ আহমদের এক কড়া প্রবন্ধ। 'পাকিস্তানঃ রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক এ প্রবন্ধ কবি ফররুখ আহমদ বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে, এ নিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আলোচানা হয়েছে। জনগণ ও ছাত্রসমাজ অকুণ্ঠচিত্তে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং এটা দৃঢ়ভাবেই আশা করা যায় যে, পাকিস্তানের জনগণের বৃহৎ অংশের মতানুযায়ী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্বাচিত হবে। যদি তাই হয় তবে একথা নিশ্চিত যে, বাংলা ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে।'

এখানে লক্ষণীয় যে, কবি ফররুখ আহমদের দৃষ্টিতে বাংলা ভাষার দাবির সঙ্গে ইসলামের প্রসারের সম্ভাবনা একাকার হয়ে গেছে এবং মাতৃভাষা বাংলা বিরোধীরাই তাঁর মতে ইসলামকে গলা টিপে হত্যার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। বিষয়টি স্মরণ রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, যারা পাকিস্তান সৃষ্টির পর ভাষা আন্দোলনের সাংগঠনিক সূত্রপাত ঘটান তারা প্রায় সবাই ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী এবং তাদের দু'একজন বাদে সবাই ইসলামের গতিশীল আদর্শের সুগভীরে বিশ্বাসী ছিলেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব থেকেই রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে আলোচনা এবং লেখালেখি চলছিল একথা সকলের জানা। পাকিস্তান আন্দোলনের মূল সংগঠনে মুসলিম লীগের প্রাদেশিক শাখার মধ্যে নাজিমুদ্দিন, মাওলানা আকরাম খাঁ, সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিমকে কেন্দ্র করে দু'টি উপদল ছিল। ভারত বিভাগের প্রাক্কালে প্রথম উপদল মুসলিম লীগের নেতৃত্ব কব্জা করায় এবং শেষোক্তদের উভয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়ায় অধিকতর সক্রিয় ও গতিশীল ছিল। উপ-দলের পূর্ববঙ্গস্থ সহ কর্মীরা খুব ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়ে পড়েন। ১৯৪৩ সালে আবুল হাশিম সাহেব প্রাদেশিক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবার পর অবিভক্ত বাংলার পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রচারের জন্য ঢাকার ১৫০, মোগলটুলীতে একটি মুসলিম লীগ কর্মী শিবির স্থাপন

www.pathagar.com

করেন। এই কর্মী শিবিরের দায়িত্ব ছিলেন টাঙ্গাইলের কৃতিসন্তান সামসুল হক। ঢাকায় মুসলিম লীগের এই গ্রুপের সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন কমরুদ্দিন আহমদ। এছাড়াও ছিলেন সর্ব জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, আজিজ আহমদ, শওকত আলী, নঈমুদ্দিন, শামসুদ্দিন আহমদ প্রমুখ। সে সময়ে ঢাকায় পাকিস্তান আন্দোলনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল 'শহীদ নজীর' লাইব্রেরী। (এই শহীদ নজীর ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী এবং সংসদের মুখপত্র পাক্ষিক 'পাকিস্তান' পত্রিকার সম্পাদক, যাকে পাকিস্তান আন্দোলনের বিকাশের দিনে সাম্প্রদায়িকভাবাপন্ন হিন্দু ছাত্ররা হত্যা করে।)

যাহোক, পাকিস্তান আন্দোলনের এই কর্মীরা পাকিস্তান সৃষ্টির পর নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শামসুল হকের নেতৃত্বে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ এবং কমরুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গণআজাদী লীগ নামে দু'টি স্বল্পায়ু সংগঠনের জন্ম দেয়। অভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যার জন্য এ দু'টি সংগঠন বেশি দূরে অগ্রসর হতে না পারলেও অন্যান্য বহু বিষয়ের মধ্যে ভাষা সম্পর্কেও এরা জোর দাবি তুলেছিলেন। তবে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের অফিস-আদালতের ভাষা ও শিক্ষার বাহন করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রস্তাব এবং সুস্পষ্ট আন্দোলনের ডাক দিয়ে আন্দোলনের সাংগঠনিক রূপরেখা প্রদানের কৃতিত্বের দাবিদার ছিলেন তমুদ্দিন মজলিস নামক ইসলামী সাংস্কৃতিক সংগঠন।

পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র দু'সপ্তাহ পর সাতচল্লিশের পয়লা সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিসের জন্ম হয় এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর মজলিসের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় ভাষা আন্দোলনের সর্বপ্রথম পুস্তিকা। 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' এই পুস্তিকার লেখক ছিলেন ৩ জন। তারা হলেনঃ (১) অধ্যাপক আবুল কাসেম (২) ড. কাজী মোতাহার হোসেন এবং (৩) আবুল মনসুর আহমদ। অধ্যাপক আবুল কাসেম পাকিস্তান আন্দোলনের তরুণ কর্মী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন হলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সভাপতি। আর আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও কোলকাতাস্থ পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির অন্যতম নেতা এবং দৈনিক ইত্তেহাদের সম্পাদক। অধ্যাপক আবুল কাসেম আমাদের প্রস্তাব শীর্ষক প্রবন্ধে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবি এবং ভাষা আন্দোলনের রূপরেখা তুলে ধরেন। ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের প্রবন্ধে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাস

www.pathagar.com

পর্যালোচনা প্রসঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতিকর্মীদের প্রতি কর্তব্য নির্দেশ করা হয়।

আবুল মনসুর আহমদের প্রবন্ধে বাংলা ভাষার দাবি উপেক্ষিত হলে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জীবনে যে অভিশাপ নেমে আসবে সে সম্বন্ধে সকলকে হুঁশিয়ার করে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হয়। তমদ্দুন মজলিস শুধু এই পুস্তিকা প্রকাশ করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি। ভাষা আন্দোলনের সাংগঠনিক রূপদানের উদ্দেশ্যে একটি রাষ্ট্রভাষা পরিষদও গঠন করে। তমদ্দুন মজলিসের সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিজ্ঞানের প্রভাষক অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া এই প্রথম সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। এ সময় রাষ্ট্রভাষা বাংলা যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে মজলিসের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত এ রকম একটি সভায় বক্তৃতা করেন কবি জসিমউদ্দিন, জনাব হাবিবুল্লাহ্ বাহার, ড. কাজী মোতাহার হোসেন ও অধ্যাপক আবুল কাসেম প্রমুখ। পাকিস্তান সৃষ্টির পর উচ্চপদস্থ আমাদের মধ্যে উর্দুভাষীদের প্রভাবে পাকিস্তানের মুদ্রা, ডাকটিকেট, পোস্টকার্ড, এনভেলপ, মানিঅর্ডার ফরম প্রভৃতিতে ইংরেজীর পাশাপাশি শুধুমাত্র উর্দুর ব্যবহার দেখে এমনিতেই জনমনে আশংকা, ক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছিল। সাতচল্লিশের দিকে ১৫ নভেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের শ্বেতাঙ্গ সচিব মি. গুডউইনের প্রচারিত এক সার্কুলারে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়েছিল। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত এই সার্কুলারে উচ্চতর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য ৩১টি বিষয়ের মধ্যে ৯টি ভাষা স্থান পেয়েছিল। এই সব ভাষার মধ্যে উর্দু, হিন্দি, ইংরেজী, জার্মান, ফ্রান্স এমন কি ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষা স্থান পায়। কিন্তু স্থান পায়নি পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলা।

এ সময় করাচীতে পাকিস্তান সরকারের এক শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ও লিগুয়া ফ্রাংক করার প্রস্তাব দেয়া হয়। এর প্রতিবাদে ৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে এক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার পর এক বিরাট মিছিল সৈয়দ আফজাল প্রমুখ মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলা ভাষার সমর্থনে তাদের প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। ডিসেম্বর মাসে উর্দু সমর্থক কিছু লোক বাংলা সমর্থকদের উপর হামলা চালায়। এতে বেশ কয়েকটি সংঘর্ষের মাধ্যমে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে।

পূর্বোল্লিখিত মিঃ গুডউইনের প্রচারিত সার্কুলার উল্লেখ করে অধ্যাপক আবুল কাসেম কোলকাতার দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি বিবৃতি

www.pathagar.com

পাঠিয়েছিলেন। বিবৃতিটি এবং এ সম্পর্কে এক কড়া সম্পাদকীয় ইত্তেহাদ -এর ১ শে ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হলে ভাষা আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে নতুন রে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ইতোমধ্যে মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দী ও হাশিম পের ছাত্র কর্মীরা ১৯৪৮ এর ৪ঠা জানুয়ারিতে এক সভায় মিলিত হয়ে জিমুদ্দিন ও আকরাম খাঁ সমর্থক শাহ্ আজিজের নেতৃত্বাধীন মুসলিম ছাত্র গের বাইরে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ নামে একটি স্বতন্ত্র ছাত্র সংস্থা ন করেন। এই সংস্থার আহ্বায়ক নির্বাচিত হন নঈমুদ্দিন আহমদ। আজিজ হমদ, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, আব্দুর রহমান চৌধুরী, দবিরুল লাম প্রমুখ ছাত্র নেতা সাংগঠনিক কমিটির সদস্য পদে নির্বাচিত হন। এই পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনের হাসে যথেষ্ট সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে।

চল্লিশের ২৫ শে ফেব্রুআরি পাকিস্তান গণপরিষদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাবু ন্দ্র নাথ দত্ত ইংরেজী ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা র দাবি জানালে এ দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়। ২৬ শে ফেব্রুআরি এর প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে এক ছাত্র হয়। এতে বিভিন্ন বক্তা ভাষা আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে এগিয়ে ত শিক্ষিত সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। এরপর তমদ্দুন মজলিসের বিল্ডিংস্থ অফিসে অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এবং হলের প্রতিনিধিকে সংগ্রাম পরিষদে কো-অপ্ট করে নেয়া হয় এবং ১১ই কল প্রদেশে ধর্মঘট ও প্রতিবাদ দিবস পালনের আহ্বান জানানো হয়।

তিবাদ দিবসের সমর্থনে কোলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকায় সর্বজনাব আলম, আবুল কাসেম, নঈমুদ্দিন আহমদ, তফাজ্জল আলী, আনোয়ারা কমরুদ্দিন আহমদ, শামসুল হক, এ সালাম, বজলুল হক, সৈয়দ ইসলাম, আসলাম, মোহাম্মদ তোয়াহা , অলি আহাদ ও আব্দুল চৌধুরী এক বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিতে তারা বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিস ১১ই মার্চ বৃহস্পতিবার হরতাল ঘোষণা সংযুক্ত উপ-কমিটির কর্মসূচী অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে ও শৃঙ্খলার ঘট পালনের জন্য আমরা সকল রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল ছাত্র ও নাগরিকদের দন জানাচ্ছে।' (জাতীয় রাজনীতি –অলি আহাদ)।

www.pathagar.com

১১ই মার্চের কর্মসূচী হক, এম এম হক ও এ হাই প্রমুখ পাকিস্তান রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগ নেতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার ফলে ঢাকাগামী কয়েকটি ট্রেন বন্ধ থাকে। সরকারি কর্মচারিদের বিপুল অংশও অফিসে অনুপস্থিত থাকে। সচিবালয়ের সামনে পিকেটিংয়ের সময় কিছুসংখ্যক পিকেটার গ্রেফতার হন এবং কিছু পিকেটারের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ফলে ঢাকা শহর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পরিস্থিতির এই মোড় পরিবর্তনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ শিগগিরই ঢাকা সফরের কথা মনে করে তিনি এ ভীতবিহ্বলতার পরিচয় দেন। তিনি তাড়াতাড়ি সংগ্রাম পরিষদের সংগে চুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে প্রাদেশিক পরিষদে প্রস্তাবের মাধ্যমে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের অফিসাদি এবং শিক্ষার মাধ্যম করা এবং পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার জন্য সুপারিশ করা, ভাষাবন্দীদের মুক্তিদান ও সকল গ্রেফতারি পরওয়ানা প্রত্যাহার, সংবাদপত্রের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, পুলিশের নির্যাতন সম্বন্ধে তদন্তের ব্যবস্থা, ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অপবাদ প্রত্যাহার প্রভৃতি শর্ত মেনে নিয়ে চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তিমাফিক ভাষাবন্দীদের মুক্তিদানের ফলে পরিস্থিতি অনেকখানি শান্ত হয়ে আসে। পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী কায়েদে আজম ১৯ শে মার্চ ঢাকা আসেন। তাকে তেজগাঁও এয়ারপোর্টে বিপুল সম্বর্ধনা দেয়া হয়। রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভায় এবং পরবর্তীকালে কার্জন হলের বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি ঘোষণা করেন একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এতে বাংলা ভাষা সমর্থক ছাত্র-জনতা ক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু সে সময় কায়েদে আজমের বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে কোন আন্দোলন নতুনভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। যদিও তুষের আগুনের মত ভাষার দাবিতে ক্ষোভ সঞ্চারিত হতে থাকে।

ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে কয়েকটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবিদার। এর প্রথমটি ভাষা আন্দোলনের অঘোষিত মুখপত্র সাপ্তাহিক সৈনিক এর আত্মপ্রকাশ, '৪৮ -এর 'আন্দোলনে ভাটা পড়ার পর অধ্যাপক আবুল কাসেমসহ আন্দোলনের কিছুসংখ্যাক নেতার মনে স্থায়ীভাবে আন্দোলন সৃষ্টির প্রয়োজনে একখানি নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশের চিন্তা করেন। ১১ই মার্চের হরতালের প্রয়োজনে রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগের নেতা এস এম হক, আব্দুল হাই প্রমুখের এবং সরকারী কর্মচারি সমিতির আতিয়ার রহমানের সঙ্গে তার

www.pathagar.com

যোগাযোগ হয়েছিল আগেই। তাঁরা জনাব কমরুদ্দিন আহমদ এবং এডভোকেট নুরুল হুদা প্রমুখ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন ছাত্রনেতা ঐ উদ্যোগকে উৎসাহ দিলেন।

এর ফলে ১৯৪৮ সালের ১৪ই নভেম্বর সাপ্তাহিক সৈনিক আত্মপ্রকাশ করে। সৈনিক এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন বিশিষ্ট কথাশিল্পী শাহেদ আলী। শাহেদ আলী বিভাগ পূর্বকালে সিলেট থেকে পকাশিত প্রভাতী নামের উচ্চমানের একখানি পাক্ষিক সম্পাদনা করতেন। সৈনিক -এর সংগে প্রথম পর্যায়ে আর যারা জড়িত ছিলেন তারা হলেন এনামুল হক (রেডিও-টিভির সাবেক পরিচালক) সানাউল্লাহ নূরী, মোস্তফা কামাল, আব্দুল গফুর প্রমুখ। শাহেদ আলীর অবর্তমানে শেষোক্ত জন এর সম্পাদক হন। সৈনিক সম্পাদনার সাথে অধ্যাপক আবুল কাসেম ছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ে আর যারা জড়িত ছিলেন তারা হলেন সর্বজনাব হাসান ইকবাল, দিদারুল আলম, শফিক উদ্দিন আহমদ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে এবং ভাষা আন্দোলনের শেষ দিন পর্যন্ত সাপ্তাহিক সৈনিক-এর অবদান ছিল এক কথায় অনন্য।

১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলন মার্চের পর বলিষ্ঠভাবে অগ্রসর হতে না পারলেও '৪৮ এর আন্দোলন বাংলাবিরোধী মহলে টনক নাড়িয়ে দিয়েছিল। এ সময়ের একটা ঘটনাকে কেন্দ্রকরে সিলেটের মুসলিম লীগ সমর্থক সাপ্তাহিক 'যুগভেরী' আতংকগ্রস্ত হয়ে এমন কথা ছেপেছিল যে ঢাকায় পাকিস্তান সরকারের পতন ঘটেছে এবং তমদ্দুন মজলিস সরকার দখল করেছে। প্রকৃতপক্ষে ১১ই মার্চ প্রমাণিত হয়েছিল যে, বাংলা ভাষার দাবিকে কোনক্রমেই ঠেকানো যাবে না। এ ধারণার বশবর্তী হয়েই বাংলা বিরোধিরা বাংলা ভাষার অগ্রগতি পরোক্ষভাবে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় উর্দু হরফ প্রবর্তনের চেষ্টা চালায়।

তবে তমদ্দুন মজলিস ও ছাত্র সমাজের প্রবল বাধার মুখে এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯৪৯ সালের ২৩ ও ২৪ শে জুন ঢাকার টিকাটুলিস্থ্ গার্ডেনে একটি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনের মাধ্যমে এ দেশে প্রথম বিরোধি রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়। পাকিস্তান আন্দোলন এবং আমাদের লাইন তথা বিরোধী আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলন খ্যাত মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৪৮ সালেই পূর্ব পাকিস্তানে আগমন করেন। তিনি হন এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক হন টাঙ্গাইলের উপ-নির্বাচনে বিজয়ী মুসলিম লীগ

www.pathagar.com

কর্মী শিবিরের তরুণ নেতা শামসুল হক, আতাউর রহমান খান সহ-সভাপতি, শেখ মজিবুর রহমান যুগ্ম-সম্পাদক, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও রফিকুল হোসেন সহ-সম্পাদক এবং ইয়ার মুহাম্মদ খান কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। আওয়ামী মুসলিমলীগের প্রতিষ্ঠার ফলে ভাষা আন্দোলনসহ স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের গতিধারা আরও জোরদার হবার সুযোগ পায়।

১৯৫০ সালে জনাব কমরুদ্দিন আহমদের উদ্যোগে ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরী হলে যে জাতীয় মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তার পটভূমি ছিল পাকিস্তান গণপরিষদে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান কর্তৃক পেশকৃত মূলনীতি কমিটির প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনে রাষ্ট্রভাষাসহ বিভিন্ন প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের দাবি দাওয়া অবহেলিত হওয়ায় এই সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলা রাষ্ট্রভাষা সহ শিথিল ফেডারেল ধারায় শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর প্রস্তাবনা প্রনীত হয়। যা পরবর্তী কালে শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনে যথেষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়েছে। ১৯৫২ এর আগে ১৯৫১ সালে কমিউনিস্ট প্রভাবিত পূর্ব পাকিস্তানে যুবলীগের প্রতিষ্ঠাপূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল। পরবর্তীকালে এর নেতৃবৃন্দ ভাষা আন্দোলনে প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হন। অবশ্য যুবলীগের বহু নেতাই কমিউনিজমে বিশ্বাসী ছিলেন না। ইতোমধ্যে ইসলামী আন্দোলন ও ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যেই বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আবুল হাসিম ঢাকা আগমন করেন। তিনি স্বাভাবিক ভাবেই তমদ্দুন মজলিসের আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন।

পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ও ওলামায়ে ইসলামের বহু নেতা যদিও উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু একই সময় তাদের একটি অংশ বাংলা ভাষার প্রতি কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। বায়ান্ন পরবর্তীকালে এরাই পূর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টি নামে আত্মপ্রকাশ করে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বলিষ্ঠ সমর্থন দান করেন। এ ছাড়া পরবর্তীকালে ইসলামী রাজনীতিতে বলিষ্ঠ অংশগ্রহণ করেন এমন কতিপয় ব্যক্তিত্বও ছাত্রজীবনে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরে ডাকসুর ভিপি হিসেবে জনাব ফরিদ আহমদ এবং ১৯৪৯ সালে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) হিসেবে জনাব গোলাম আজমের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদিকে হরফ পরিবর্তনের চেষ্টায় ব্যর্থতার পর ভাষা আন্দোলন কিছুটা ঢিমে-তালে ধাঁচেই এগুচ্ছিল। এর মধ্যে ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকার পল্টন

www.pathagar.com

ময়দানে এক ভাষণে বলে বসলেন, 'উর্দূই হবে একমাত্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' বহুদিন পর জলাশয়ে যেন ঢিল নিক্ষিপ্ত হল। ৩০শে জানুয়ারী ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরী হলে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব আতাউর রহমান।

মুসলিম ছাত্র লীগের অন্যতম নেতা কাজী গোলাম মাহবুবকে আহবায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। এই কমিটিতে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, জনাব আবুল হাশিম, জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব কমরুদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক আবুল কাসেম, জনাব অলি আহাদ, জনাব শামসুল আলম, মীর্জা গোলাম হাফিজ, জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা, জনাব আব্দুল মতিন, জনাব শওকত আলী, জনাব খালেক নেওয়াজ খান, জনাব শামসুল হক চৌধুরী, জনাব আব্দুল গফুর, জনাব খয়রাত হোসেন ও মিসেস আনোয়ারা খাতুন প্রমুখ।

১৯৫২ সালের সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ২১ শে ফেব্রুআরি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মঘট ও প্রতিবাদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সরকার ২১ শে ফেব্রুআরি বিকেলে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য সন্ধায় ৯৪ নং নওয়াবপুরস্থ আওয়ামী লীগ অফিসে জনাব আব্দুল হাশিমের সভাপতিত্বে সংগ্রাম পরিষদের সভা হয়। সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু পর দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত ছাত্র সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ছাত্ররা ছোট ছোট গ্রুপে রাস্তায় ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে গণপরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। প্রথম প্রথম এই গ্রুপের ছাত্রদের পুলিশ গ্রেফতার করতে থাকে। ক্রমে পুলিশ ও ভাষা সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এক পর্যায়ে পুলিশ বিক্ষুব্ধ ছাত্র- জনতার উপর গুলিবর্ষণ শুরু করলে বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র ও সাধারণ মানুষ হতাহত হন।

বাংলাভাষা সমর্থকদের উপর গুলিবর্ষণ ও হতাহতের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে ঢাকা মহানগরী ফেঁটে পড়ে। সারা নগরীতে বিক্ষোভ মিছিলের বন্যায় ১৪৪ ধারা ভেসে যায়। রাতে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে সংগ্রাম পরিষদের কিছু সদস্য সমবেত হয়ে পরবর্তী দিন শোক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য জনাব অলি আহাদ এ সভায় শোক দিবসে রোজা রাখার ঘোষণা দেন। পরবর্তী দিনেও পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে আরও কিছু ভাষা সমর্থক হতা হত হন। এ সময় গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে দৈনিক

www.pathagar.com

আজাদ পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন আইন সভার সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেন। পরিষদের অভ্যন্তরে মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, আনোয়ারা খাতুন, খয়রাত হোসেন প্রমুখ সদস্য বৃন্দ অধিবেশন মূলতবীর দাবিতে ওয়াকআউট করেন। সাপ্তাহিক সৈনিক একুশের ঘটনার উপর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। দ্রুতি ফুরিয়ে যাবার ফলে ২২ ও ২৩ শে ফেব্রুআরীতে এই বিশেষ সংখ্যা কয়েকবার মুদ্রণ করতে হয়। একুশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে সারা প্রদেশে ২৩শে ফেব্রুআরি প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। প্রকৃত-প্রস্তাবে ২২ শে ফেব্রুআরি থেকেই সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেঁটে পড়ে। অপরদিকে গ্রেফতারি অভিযান চলতে থাকে। একুশের পর ভাষার দাবি এমন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে যে এরপর এই দাবির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে খুব কম লোককেই কথা বলতে দেখা যায়।

ভাষা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে বাংলা ভাষার দাবির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোন বাধা না আসলেও কমিউনিস্ট মহল থেকে উত্থাপিত সমগ্র ভাষার সমান মর্যাদা' শ্লোগানের মাধ্যমে বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধি, পাঞ্জাবী, পশ্‌তু প্রভৃতি সকল ভাষার সমবিবেচনা করার অবাস্তব ও অযাচিত দাবি ওঠানো হলে অধিকাংশ বাংলাভাষা সমর্থকদের প্রবল বিরোধিতার মুখে তা নসাৎ হয়ে যায়। বায়ান্নোর ২১ ফেব্রুআরি পর ৪টি রাজনৈতিক দলের জন্ম ও পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অধ্যায় সংযোজন করে।

এগুলো হচ্ছে খিলাফতে রব্বানী পার্টি, গণতন্ত্রী দল, নেজামে ইসলাম পার্টি ও কৃষক শ্রমিক পার্টি। এই দলগুলোর সবকটি দলই মুসলিম লীগ বিরোধী এবং ভাষা আন্দোলনের সমর্থক ছিল। নেজামে ইসলাম নামে মাওলানা সাখাওয়াতুল আম্বিয়ার নেতৃত্বাধীন দলের এক পুস্তিকায় কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, তমদ্দুন মজলিস ছাড়াও বায়ান্নর আগেই ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ নামে একটি ইসলামী যুব সংস্থা জন্মলাভ করে। ভাষা আন্দোলনে এই স্বল্পায়ু প্রতিষ্ঠান সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে ছিলেন মরহুম ইব্রাহিম তাহা, সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, তরীকুল আলম, নুরুল ইসলাম প্রমুখ যুব নেতৃবৃন্দ।

www.pathagar.com

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য প্রসঙ্গে

সৈয়দ মাহমুদ

॥ এক ॥

সাহিত্য জীবন-সম্বুদ্ধ এবং জীবন-সম্পৃক্ত। জীবনের বৈচিত্র্যময় রূপরেখা, রহস্যঘন বৈশিষ্ট্য, গতিময়তা এবং সৃজনধর্মিতা --- এ সব কিছুই সাহিত্যের সম্পদ; এ সবেই সাহিত্যের পুষ্টি। জীবনকে অস্বীকার করে কোনদিন কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি- হলেও তা সাহিত্য নয়, অর্থহীন শব্দ বা সংগতিহীন বাক্যসমষ্টি মাত্র। বস্তুতঃ সাহিত্যের মুকুরেই জীবন নিয়ত বিম্বিত। এবং সাহিত্য জীবনেরই এক শৈল্পিক রূপমাত্র।

মানবজীবন বৈচিত্র্যময়। তবু এর কোন কিছুই ঐতিহাসিক সত্যের বিচার বিশ্লেষণ বহির্ভূত নয়, বরং ঐতিহাসিক সত্যের নির্ভুল ফলশ্রুতিমাত্র। মানুষ মানুষই-তবু সে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রেণী-বিভক্ত এই মানুষের মধ্যে রয়েছে কর্ম ও চেতনাগত স্বাতন্ত্র্য ও দ্বন্দ। সুতরাং শ্রেণী চেতনার বা শ্রেণী বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে মানুষের যে রূপ, তাই তার অকৃত্রিম রূপ। সাহিত্যে যখন এই অকৃত্রিম রূপটি যথার্থভাবে মূর্ত হয়, তখনই তা জীবনবাদী সাহিত্য- **সৎ-সাহিত্য**। এবং এই সাহিত্য নিয়তই ঋদ্ধ হতে থাকে সমাজ, সভ্যতা ও চেতনার অগ্রগতির ধারায়। সাহিত্য তখন অর্থহীন সংগতিহীন কথার ফুলঝুড়ি অপেক্ষা সমাজ-সচেতন সাহিত্যিকের জীবন-নির্ভর কথাই বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনকভাবে এমনি জীবন চেতনা ও দ্বন্দ্বের প্রভাব লক্ষণীয়। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের মূলে পরোক্ষে রয়েছে এ ধরনের শ্রেণী চেতনা ও দ্বন্দের প্রভাব-- ঐতিহাসিক কার্যকারণ। তদানীন্তন সমাজ ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু সামন্তরাজ শাসিত। এবং এই সামন্ত রাজতন্ত্রের সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি ছিল পুরোহিত সমাজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা। সংস্কৃত দেবভাষা, বেদ ঐশী গ্রন্থ - সুতরাং এ সবের উপর একচ্ছত্র অধিকার ছিল ব্রাহ্মণদের। রাজসভায় সংস্কৃত কবিগণ হয়েছেন আদৃত। ধর্মীয় অনুশাসনাদী পালন ও অনুষ্ঠানের ব্যাপারে এবং ক্ষেত্র বিশেষে শাসন কার্যেও ব্রাহ্মণেরা রেখেছেন তাদের আধিপত্য। অপরপক্ষে, কৃষকসহ কায়িক শ্রমে জীবিকা উপার্জনকারী দেশের বৃহত্তর বিপুল সংখ্যক মানুষেরা ছিলেন সামন্তপ্রভু

www.pathagar.com

ও ব্রাহ্মণসমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে ও বিচারে অনভিজাত – প্রাকৃত বা প্রজাপুঞ্জ। 'দেবভাষা' ও রাজসভার ভাষা সংস্কৃত এবং বেদান্ত দর্শন পাঠ বা চর্চার ক্ষেত্রে এই প্রাকৃতজনদের অধিকার ছিল নিষিদ্ধ। ফলশ্রুতিতে দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টি নিজেদের মধ্যে কথা-বার্তা ও ভাবধারা বিনিময়ের জন্য সৃষ্টি করে নিয়েছিল এক কথ্যভাষার মাধ্যম -- অভিজাত সামন্তপ্রভু ও ব্রাহ্মণেরা অবজ্ঞাভরে যার নাম দিয়েছিলেন প্রাকৃত ভাষা বা প্রজাপুঞ্জের ভাষা।

ইতিহাসের ধারা অনিরুদ্ধ। আর, এই ধারারই ফলশ্রুতিতে সেদিনের অত্যাচারিত ও নিগৃহীত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধ। সামন্তরাজ ও ব্রাহ্মণ-শাসিত মানুষকে তিনি শোনালেন শান্তির বাণী। সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় তিনি প্রচার করলেন তাঁর ধর্মবাণী -- সৃষ্টি হলো প্রাকৃত ভাষারই এক স্বাধর্মী ভাষা পালি। সাধারণ মানুষও দলে দলে আকৃষ্ট হতে লাগলো নতুন এই ধর্মবাণীতে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও উচ্চবর্ণের হিন্দু সামন্ত শাসকেরা বিচলিত হয়ে পড়লেন নতুন এই ধর্মের আবির্ভাবে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা ভয় দেখালেন সাধারণ মানুষের ভাষা চর্চাকারীদের পরিণামে 'রৌরব' নামক নরকে স্থান হবে বলে। কিন্তু কোন ভয়-ভীতিতেও যখন ফল হলোনা, তখন তারা বেছে নিলেন অত্যাচার ও নির্যাতনের পথ। বাঙলার বুকে সেদিন নব-দীক্ষিত বৌদ্ধ ও তাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন অনার্য নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উপর শুরু হলো বিবিধ পন্থায় অত্যাচার আর নিগ্রহ-- বলা যায় এক ধরনের শ্রেণী-নির্যাতন। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরাও উপলব্ধি করতে পারলেন তাদের ধর্ম প্রচারের পথে বাধা প্রতি পদে পদে। তাই তারা সেদিন সৃষ্টি করলেন এক সাঙ্কেতিক ভাষা, যার আর এক নাম সান্ধ ভাষা। এই সাঙ্কেতিক বা সান্ধ ভাষার মাধ্যমে প্রচারিত হতে লাগলো বুদ্ধবাণী, সৃষ্টি হলো চর্যাপদ -- আদি বাঙলা ভাষার প্রথম নিদর্শন।

গৌতম বুদ্ধ শোষিত নির্যাতিত মানবতাকে বরাভয় শুনিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সামন্ত আবহাওয়ায় লালিত সেদিনের মানুষ পুরোপুরিভাবে ভাববাদী চেতনা হতে মুক্ত হতে পারেনি। স্বয়ং বুদ্ধও প্রকৃতপক্ষে ভাববাদী চেতনামুক্ত ছিলেন না। শোষিত মানুষের মুক্তির পথ যে সংগ্রাম, বুদ্ধের বাণীতে তা ছিল অনুপস্থিত। তিনি শোষিত মানবতাকে মুক্তির উপায় হিসেবে আত্মিক পরিশুদ্ধির বাণী শোনালেন। মুক্তির পথ-- শুদ্ধ দৃষ্টি, শুদ্ধ স্মৃতি, পুণ্য কর্ম, সত্য ধ্যান। রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সোচ্চার আহ্বান বুদ্ধবাণীতে ধ্বনিত হলো না। আর তাই, ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের হিন্দু সামন্ত শাসকদের অত্যাচার ও নির্যাতন সাধারণ মানুষের উপর উত্তরোত্তর বেড়েই চললো।

www.pathagar.com

বাঙলাভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ যদিও বৌদ্ধ ধর্মের গূঢ়ার্থকে প্রকাশের জন্য রচিত হয়েছিল, কিন্তু তা শুধু ধর্মবাণীতেই সীমিত থাকলো না। পূর্বেই বলেছি, সাহিত্য জীবন- সম্বুদ্ধ ও জীবন- সম্পৃক্ত। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরাও ধর্মের মৌলার্থ প্রচার করতে যেয়ে তাঁদের সমকালীন সমাজ জীবনকে বিস্মৃত হতে পারলেন না। চর্যার ছত্রে ছত্রে তাই সেদিন স্বাক্ষর রেখে গেল তৎকালীন সমাজ জীবনের ছবি, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার কথা, যদিও অস্পষ্টভাবে। চর্যা সাহিত্যে তাই আমরা পেলাম মাঝি, নৌকা বাওয়া, বিবাহে যৌতুক প্রথা, সামাজিক উৎসব, প্রিয়জনের প্রতীক্ষা ইত্যাদি চিত্রের সাথে নিম্ন বর্ণের মানুষের জীবন গাঁথা-- "নগর বাহিরে ডোম্বী তোহার কুড়িয়া", আমরা জানলাম নিম্নবর্ণের মানুষের বসবাস ছিল নগরের বাইরে। আমরা আরো জানলাম ধর্মের ধ্বজাধারীদের মাঝেও বিরাজমান লাম্পট্যের কথা-"কই শুনি হালো ডোম্বী তোহার ভাবরিআলি; অন্তে কুলীণজন, মাঝে কাপালী।" আবার এই চর্যাতেই উপলব্ধি করলাম বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সত্যোপলব্ধির চেতনা সহৃদয়জনে পৌঁছে দেবার ব্যাকুলতা। এ যেন সেই সত্য ধ্যানোপলব্ধির উচ্ছ্বসিত বাণী --শোন, শোন, তমসার পার হতে আমি দেখেছি সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরাও তাই শুধু ধর্মবাণীকেই চর্যার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ করলেন না, তাঁদের সত্যোপলব্ধির আনন্দ পৌঁছে দেবার আকুলতাও প্রকাশ করলেন। আর তাই, ধর্মবাণী চর্যাপদ গীতি-কবিতার লক্ষণাক্রান্ত হলো- চর্যাপদ সাহিত্য হলো।

॥ দুই ॥

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বেদনার সন্তান। অভিজাত সামন্ত প্রভু ও তাদের স্বার্থরক্ষক ব্রাহ্মণ পুরোহিত শাসিত সমাজে যখন প্রাচীন বাঙলার বৃহত্তম কৃষক ও কর্মজীবী সম্প্রদায় নিদারুণভাবে শোষিত, অত্যাচারিত ও নিগৃহীত; যখন তাদের মতামত ও ভাব প্রকাশের পথে শাসক সম্প্রদায় সৃষ্ট অচলায়তনে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ, যখন সমগ্র দেশ জুড়ে শোষিত ও অত্যাচারিত মানুষের জীবনে হতাশা ও নৈরাশ্যের গাঢ় তমসা, তখন এমনি এক পরিবেশে শোষিত ও অত্যাচারিত মানুষের জিজীবিষা এবং অনুভূতি প্রকাশের সুতীব্র আকাঙ্খায় লালিত হয়েছিল বাঙলা ভাষা। এর জন্মলগ্নে কোন রাজ-দরবারের সাহিত্য-অঙ্গনে শুভাশিস ধ্বনিত হয়নি- ধ্বনিত হয়নি কোন আবাহনী অথবা কোন বন্দনাগীত। রাজা, রাজ-দরবার ও অভিজাত পরিমণ্ডল হতে যারা দূরে, বহু

www.pathagar.com

দূরে; মাটির পৃথিবীর সাথে যাদের গভীর আত্মীয়তা, কেবলমাত্র সেই অনভিজাত সাধারণ মানুষের হৃদয়ের সবটুকু রং আর ঐশ্বর্যে দিনে দিনে পুষ্টি লাভ করেছিল সেদিনের নবজাতক বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য। অবশ্য, পরবর্তীকালে মুসলিম শাসকেরা এবং অভিজাতমণ্ডলী স্বীকৃতির বরমাল্যে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছিলেন সত্য, কিন্তু এই আপাতদৃষ্ট সত্যের অন্তরালে রয়ে গেছে আর একটি অনর্ঘ সত্য। এ সত্য কেবলমাত্র বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাসের ব্যাখ্যায় নির্ণয় সম্ভব। এবং এই ইতিহাসের কষ্টিপাথরেই সম্ভব সেই সত্যের যথার্থ মূল্যায়ন।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক–বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এক ক্রান্তিলগ্ন। সামন্তরাজ ও পুরোহিতদের শোষণ ও শাসনে সেদিনের বাঙলা দেশের গণ-জীবনে যখন এক প্রতিবোধন-লগ্ন, ঠিক এই সময়ে সংঘটিত হয়েছিল তুর্কী আক্রমণ বাঙলাদেশে। ১২০১ খৃষ্টাব্দে তুর্কী আক্রমণে সামন্তরাজ লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ের পর যেমন একদিকে সেদিনের বাঙলাদেশ বিদেশী শক্তির করায়ত্ত হলো, তেমনি অভিজাত সামন্তপ্রভু ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের বহুদিনের অত্যাচার ও শোষণের ধারাতেও অত্যয় সূচনা করলো। তুর্কীদের আক্রমণ ও বিজয়ে সেদিন পর্যুদস্ত হয়েছিলেন অভিজাত সামন্ত প্রভু ও তাদের স্বার্থরক্ষক পুরোহিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, তাদের আভিজাত্যের কৃত্রিম অহঙ্কারও হয়েছিল ধূলাবলুণ্ঠিত। আকস্মিক এই বিপর্যয়ের ঘোর যখন তাদের কাটলো তখন তারা দেখলেন, দেশের যে অগণিত সাধারণ মানুষকে মনুষ্যত্বের ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এতদিন ধরে আভিজাত্যের কৃত্রিম পরিমণ্ডল তারা সৃষ্টি করেছিলেন, তার আর কোন অস্তিত্বই নেই। বালির প্রাসাদের মতোই তা ধসে গেছে; এবং আজ তাদেরও স্থান এতদিনের অবহেলিত সেই অনভিজাত মানুষদেরই মাঝে। এই নতুন উপলব্ধি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করলো আর এক নতুন চেতনায়।

তুর্কীগণ কর্তৃক বাঙলাদেশ বিজিত হবার পর প্রথম দিকে সাধারণ মানুষেরা এই নতুন শক্তিকে অভিনন্দিত করলো; কেননা, তারা দেখেছিল এই নতুন শক্তির অভিঘাতে অভিহত হতে শোষক ও অত্যাচারী সামন্ত প্রভু ও তাদের পৃষ্ঠপোষক ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের। এই সময়ে রচিত ধর্মঠাকুরের উপাসক রামাই পণ্ডিতের "শূন্যপুরাণ"-এর 'নিরঞ্জনের উষ্মা' নামক অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে, বর্ণ হিন্দু ও ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হয়ে তাদেরকে শাস্তি দানের নিমিত্তে স্বয়ং ধর্মঠাকুরই নাকি যবণের ছদ্মবেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যাহোক, প্রাথমিক পর্যায়ের এই সন্তুষ্টি ও বিস্ময়ের ঘোর যখন কাটলো, তখন তারাও উপলব্ধি করলেন যে, তুর্কী আক্রমণে পর্যুদস্ত এক কালের অভিজাত শ্রেণী আজ শুধুমাত্র

www.pathagar.com

সাধারণ মানুষের সম পর্যায়ে এসে পৌঁছেননি– তাদের পক্ষ থেকেও আসছে সমন্বয় চেতনার এক আহ্বান।

প্রাচীন বাঙলায় দু'টি প্রধান ধর্ম ছিল হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম। এ দু'টি ধর্মই বহুকাল ধরে সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট হয়েছিল এ দেশের মাটির রসে এবং মানুষের পৃষ্ঠপোষকতায়। কিন্তু বিজয়ী তুর্কীরা এদেশে যে ধর্মের বাণী বহন করে আনলেন, তা ছিল বাঙলা তথা প্রাচীন ভারতবর্ষের বাইরের ধর্ম। তুর্কী আক্রমণ ও বিজয়ের ফলে প্রাচীন বাঙলার বুকে সেদিন যে নতুন ধর্মের আবির্ভাব ঘটলো, এদেশের মানুষেরা তাকে দু'টি স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করলো। ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের অত্যাচারিত, নিগৃহীত এবং মনুষ্যত্বের নূন্যতম অধিকার হতে বঞ্চিত নিম্নবর্ণের মানুষের একটি অংশ ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। কেননা, তারা এই ধর্মে বর্ণভেদের কোন অস্তিত্ব দেখলেন না। এ বাদেও সামাজিক রীতি-নীতি, আচার অনুষ্ঠান এবং উপাসনার ক্ষেত্রে এই ধর্মে কোন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ছিল না। অন্য দিকে, এতদিন ব্রাহ্মণ ও সামন্ত বর্ণহিন্দু শাসিত সমাজে একই ধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও বর্ণ হিন্দুদের কাছ হতে নিম্নবর্ণের মানুষেরা যে অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা ও অবহেলা পেয়েছিলেন, তাতে তারা কোনভাবেই অভিজাত বর্ণহিন্দুদেরকে স্বধর্মী আপনজন তো ভাবতেই পারেননি, উপরন্তু ধর্ম চর্চা ও উপাসনার ক্ষেত্রে তাদের অধিকার অস্বীকৃত হওয়ায় হিন্দু ধর্মের মধ্যেই ইতিমধ্যেই একটি লৌকিক ধর্মচেতনার জন্ম হয়ে গিয়েছিল। এ সময়ে বৌদ্ধ ধর্মও অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়ে ক্ষেত্রবিশেষে হিন্দুধর্ম ও লৌকিক ধর্ম চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

সর্পবহুল বাঙলাদেশে মনসা, শক্তির প্রকাশরূপী চণ্ডী প্রভৃতি লৌকিক দেব-দেবীদের পূজাচর্না শুরু হয়েছিল নিম্নবর্ণের অনভিজাত মানুষের মধ্যে। এসব লৌকিক দেব-দেবীরা বৈদিক শাস্ত্রসম্মত দেব-দেবী ছিলেন না কোন দিন। তাই সামগ্রিকভাবে একই হিন্দুধর্মের অনুসারী হয়েও এ সব নিম্নবর্ণের মানুষেরা বর্ণহিন্দুদের দৃষ্টিতে ছিলেন অনেকটা বিধর্মীদেরই মতো। বস্তুতঃ অভিজাত সামন্ত বর্ণহিন্দু ও ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজে নিম্নবর্ণের মানুষের মাঝে লৌকিক ধর্মচেতনার বিকাশ ছিল অনেকাংশে পরোক্ষ বিদ্রোহসূচক। অবশ্য এই চেতনার জন্যে তাদেরকে ভোগও করতে হয়েছিল অভিজাত শাসক বর্ণহিন্দুদের হাতে অশেষ লাঞ্ছনা, অবহেলা ও নির্যাতন। তাই পরবর্তীকালে বাঙলাদেশ বিজয়ী মুসলমানদের সান্নিধ্যে এসে ইসলাম ধর্মের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় নিরাপত্তার অনেকখানি নিশ্চয়তা দেখতে পেয়েছিলেন বলেই তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু ধর্মান্তরিত এই শ্রেণী বাদে আর

www.pathagar.com

যারা রইলেন, তারা বিদেশের এবং বিদেশীগণ অনুসৃত এই ধর্মকে গ্রহণ করলেন না- গ্রহণ করতে পারলেন না নতুন এই শক্তিকেও মনে প্রাণে। সর্বোপরি তুর্কী মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজয়ের ফলে হিন্দু ধর্মানুসারী সামন্ত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের অবসান হয়েছিল ঠিক, কিন্তু এই স্থান পরবর্তীকালে অধিকার করলো মুসলমান শাসক সম্প্রদায়। ইতিহাস নির্দেশিত পথ বেয়ে নতুন সামন্ত ও অভিজাত সম্প্রদায় সৃষ্টি হলো তাদের মধ্য হতেও।

প্রাচীন বাঙলার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যখন এই অবস্থা, তখন তুর্কী আক্রমণে অভিহত এককালের অভিজাত সামন্ত ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সমন্বয়ধর্মী চেতনার আহ্বান নিয়ে এগিয়ে এলেন সাধারণ মানুষের কাছে। বিজয়ী মুসলমানেরা প্রাচীন বাঙলার মাটিতে যেভাবে তাদের শাসন ক্ষমতা সুদৃঢ় করছিলেন, তাতে এই পর্যুদস্ত অভিজাত বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় উপলব্ধি করলেন যে, বিজয়ী এই নতুন শক্তির মোকাবিলায় টিকে থাকতে হলে চাই এই দেশবাসীর মধ্যে একতা ও পারস্পরিক আস্থাবোধ। দেশের বৃহত্তর নিম্নবর্ণ সম্প্রদায়ের মানুষকে অনভিজাত জ্ঞানে দূরে সরিয়ে রেখে ইপ্সিত এই ঐক্য সম্ভব নয়। দেশবাসীকে প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম ভিত্তিক এবং পরোক্ষভাবে বিদেশী শাসন-বিরোধী ঐক্য চেতনায় উজ্জীবনের এক প্রয়াস নিলেন তারা সমন্বয়ধর্মী কার্যক্রমের মাধ্যমে। ফলে, এতদিনের অবহেলিত সাধারণ মানুষ যে ভাষায় কথা বলতো বা ভাব প্রকাশ করতো, সেই ভাষাকে সমন্বয়প্রয়াসী বর্ণহিন্দুরা শুধু স্বীকৃতিই দিলেন না-ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মবাণী প্রকাশের জন্যও গ্রহণ করলেন। কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণের এবং মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবৎ-এর অনুবাদ করলেন সাধারণ মানুষের ভাষায় অর্থাৎ মধ্যযুগীয় বাঙলা ভাষায়। ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মবাণী বাঙলা ভাষায় অনুবাদের মৌল উদ্দেশ্য ছিল দেশের বৃহত্তর সাধারণ মানুষের মনে পুরাতন ধর্মচেতনার পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে সকলকে এক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করা। স্বয়ং কৃত্তিবাস এবং মালাধর বসু উভয়েই এই মৌল উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বাল্মীকি রামায়ণ বাঙলায় অনুবাদ করতে গিয়ে কৃত্তিবাস নিজেই বলেছেন:

"সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।

লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত।"

একইভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ সম্পর্কে শ্রী মালাধর বসুও বলেছেন:

"ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বাঁধিয়া, লোক নিস্তারিতে কহি পাঁচালী রচিয়া।"

www.pathagar.com

সমন্বয়ধর্মী এই চেতনার ফল আর একটি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি যে লৌকিক দেব-দেবীগণ সুদীর্ঘ কাল ধরে অভিজাত বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক অস্বীকৃত ছিলেন, সমন্বয়ধর্মী চেতনালোকে তাদেরও স্বীকৃতি লাভ ঘটলো দেব-দেবীর মর্যাদায়। আর, এমনিভাবে প্রাচীন বাঙলার মাটিতে এই সমন্বয়ধর্মী চেতনা পরোক্ষে এক ধরনের ধর্মীয় জাতীয়তার জন্ম দিল।

সমন্বয়ের আহবান আসলো আরো একটি দিক হতে। বিজয়ী মুসলমানগণ যাযাবর চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন না। প্রাচীন বাঙলাদেশ জয়ের পর নির্বিচারে লুণ্ঠন করে এদেশ ত্যাগ করে যাবার কোন অভিলাষ বা পরিকল্পনা তাদের ছিল না। বাঙলাদেশ জয়ের পর তাঁরা এদেশে তাদের শাসনকে স্থায়ী ও সুদৃঢ় করার প্রয়াস পেলেন। কিন্তু এই শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণের পথে তারা প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে যা দেখলেন তা হচ্ছে, এ দেশীয় ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান এবং রীতিনীতি সম্পর্কে তাদের সীমিত জ্ঞান ও চেতনা। দেশ শাসন করতে হলে জানতে হবে এদেশের মানুষকে এবং এই জানা সম্ভব পরিচিতি ও ভাবধারার আদান প্রদানের মাধ্যমে। এই পরিচিতি ও ভাবধারা বিনিময়ের পথে প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল এ দেশীয় ভাষা সম্পর্কে বিজয়ী শক্তির সীমিত জ্ঞান। তাই তাঁরা এগিয়ে এলেন এ দেশীয় ভাষা, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি সম্পর্কে জ্ঞান ও উপলব্ধি লাভের জন্য। ফলে, এদেশের অধিকাংশ মানুষের ভাষা রাজদরবারের সমাদর লাভ করলো।

ইলিয়াস শাহী এবং হুসেনশাহী শাসনামলে বাঙলা ভাষা মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলো। ইলিয়াসশাহী এবং হুসেনশাহী শাসনামলে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মুসলমান শাসকরা যা কিছু পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তার মূলে রয়েছে প্রধানত তিনটি কার্যকারণ। প্রথমতঃ, তাঁরা সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাঙলা ভাষা এদেশের অধিকাংশ মানুষের ভাষা। সুতরাং এদেশের মানুষকে জানতে হলে এবং তাদের হৃদয় জয় করতে হলে তাদের ভাষা জানতে হবে, তাদের ভাষায় কথা বলতে হবে। দ্বিতীয়ত এককালের অভিজাতদের দৃষ্টিতে বাঙলা 'প্রাকৃতজনের ভাষা' হিসাবে বিবেচিত হলেও বিদেশী নতুন মুসলমান শাসকদের কাছে সংস্কৃত এবং বাঙলা উভয়ই অপরিচিত ভাষা, সুতরাং উভয়েরই ছিল একই মর্যাদা। এর মধ্যে বাঙলা অধিকাংশ মানুষের ভাষা বিধায় রাজদরবারের প্রায়োজনেই তার সমাদর হয়েছিল। তৃতীয়ত এবং সর্বোপরি সত্য হচ্ছে, বিজয়ী এই মুসলমান শক্তি বাঙলার বাইরে থেকে এদেশে আগমন করলেও তাঁরা এদেশে স্থায়ীভাবে

www.pathagar.com

বসবাস করতে চেয়েছিলেন। দেশে দেশে ও কালে কালে বিজয়ী শক্তি সাধারণত তাদের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের স্বার্থে নিজেদের ভাষাকে বিজিত দেশে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠা করে থাকে। কিন্তু বাঙলাদেশ বিজয়ী মুসলমানদের বেলায় ঘটলো এ ক্ষেত্রে অনন্য ব্যতিক্রম। তাঁরা এদেশের মানুষের সাথে, তাদের ভাষা ও জীবন-যাপন পদ্ধতির সাথে সম্যক পরিচিত হয়ে, একাত্ম হতে চেয়েছিলেন। এই তিনটি কার্যকারণের ফলে মুসলমান শাসকগণ এদেশের অধিকাংশ মানুষের ভাষা বাঙলা ভাষাকে রাজদরবারে স্বীকৃত দানে কুণ্ঠিত হননি। হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকেরাও তাই অনন্য অবদান রেখেছেন বাঙলা সাহিত্যে।

প্রাচীন বাঙলার বুকে সমন্বয় চেতনার এই দ্বি-ধারা মধ্যযুগীয় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে করেছিল সবিশেষ সমৃদ্ধ, আঢ্য, বৈচিত্র্যময়। মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে তাই সৃষ্টি হলো বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গল সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য এবং প্রেমমূলক রোমান্টিক সাহিত্য। কিন্তু এই সমন্বয় চেতনা আপাতদৃষ্টিতে যতই মাধুর্যময় মনে হোক না কেন, ঐতিহাসিক সত্য বিচারে এই সমন্বয় চেতনার মূলে ছিল দু'টি স্বতন্ত্র ধারা-প্রকৃতি। একটি ধারায় ছিল উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের ধর্মীয়-সামাজিক ঐক্য চেতনা। এই সাথে সময়ের ধারায় মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটায় ক্ষেত্রবিশেষে রূপান্তরিত বৌদ্ধ ধর্মানুসারীরাও এই ঐক্য চেতনার বাইরে ছিলেন না। বলা বাহুল্য, এই ঐক্য চেতনা ছিল প্রকৃতপক্ষে বিদেশী মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই এবং কৌশলে এক ধর্মীয় জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটানো। অন্যদিকে, এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসে আগ্রহী এবং এদেশবাসীর সুখ-দুঃখের সাথে একাত্মতায় আন্তরিক হলেও মুসলমান শাসকগণ এবং এ দেশীয় মুসলমানরা তো তাদের ধর্মীয় অনুশাসন ও ঐতিহ্য বিসর্জন দিতে চাননি। এই সাথে ছিল মুসলমান শাসকগণের শাসন ক্ষমতা সুদৃঢ় ও স্থায়ীকরণের চেতনা। সমন্বয়ের এই দ্বি-মুখী চেতনার সংঘাতে মধ্যযুগের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য হয়েছে বারে বারে স্পন্দিত। সেই স্পন্দনের স্বাক্ষর রয়েছে ত্রয়োদশ শতক হতে উনবিংশ শতক, এমন কি বর্তমান কাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহে, বিভিন্ন আঙ্গিক–বিশিষ্ট সৃষ্টিতে ও রূপান্তরে। (সংকলিত)

www.pathagar.com

মাতৃভাষা অস্তিত্বের অদ্বিতীয় সত্তা

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌

মাতৃভাষা মানুষের সত্তা ও অস্তিত্বের অপরিহার্য ও অমোঘ অবলম্বন। ভাষা এবং প্রধানত মাতৃভাষার মাধ্যমেই মানুষ কথা বলে আত্মপ্রকাশ করে, ভাবের আদান-প্রদানও করে। ভাষা মানুষের আ-মৃত্যু সঙ্গী। মাতৃভাষার সাহায্য ও মাধ্যম ছাড়া মানুষ চিন্তা ও কল্পনা করতে পারে না, এমন কি মানুষ স্বপ্নও দেখে তার মাতৃভাষায়। অন্য ভাষায় যখন মানুষ কথা বলে, মনের ভাব প্রকাশ করে তখনও তাকে মাতৃভাষার সাহায্যেই চিন্তা-ভাবনা করতে, বক্তব্য সাজাতে এবং মনে মনে তা অন্যভাষায় অনুবাদ করে নিতে হয়। মাতৃভাষার এমন অপরিহার্যতা, গুরুত্ব এবং তাৎপর্য বলেই, মাতৃভাষা মানুষ সহজে বিস্মৃত হতে পারেন। অন্যভাষা বা বহু ভাষা আয়ত্ত এবং অধিকগত করা সত্ত্বেও মাতৃভাষা তার অস্তিত্বের অদ্বিতীয় অঙ্গ বা সত্তা হয়ে থাকে।

মানুষ জন্মসূত্রে কিছু শব্দ, ধ্বনি ও অস্পষ্ট এবং অর্থহীন বুলি তথা 'ও' 'আ' ইত্যাদি উচ্চারণ করার ও কান্নার স্বাভাবিক শক্তি নিয়ে এলেও কোন ভাষা নিয়ে আসেনা। জন্মের পর থেকেই মানুষকে ক্রমান্বয়ে ভাষা আয়ত্তে আনতে হয়, মাতৃভাষাও শিখতে হয়। যে পরিবারে, পরিবেশে বা মাতৃ ও ধাত্রীর কোলে মানুষ জন্মের পর থেকে শৈশব থেকে ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠে, সেই পরিবার বা পরিবেশ থেকে এবং বিশেষভাবে মাতৃ ও ধাত্রীর কোল থেকে তাদের উচ্চারিত ভাষা থেকেই মানুষ মাতৃভাষা শিক্ষা শুরু করে। একারণেই, জন্মের পর থেকেই মানুষ মাতৃকোলে বা ধাত্রী কোলে থেকে শেখা শুরু করে বলেই মানুষের প্রথম শেখা ভাষার নাম মাতৃভাষা। এই ভাষার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য মানুষ অনেক আত্মত্যাগেও প্রস্তুত থাকে। মাতৃভাষা ভালোভাবে আয়ত্ত করা এবং শিক্ষার জন্যে মানুষকে যে অনেক পরিশ্রমও করতে হয় তাও জানা কথা। মানুষের মাতৃভাষা আয়ত্তে আসে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ও প্রকৃতিগতভাবে, তবে মাতৃভাষা সঠিকভাবে শিক্ষা ও আয়ত্তে আনার এবং বলা ও লেখার জন্য মানুষকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। পদ্ধতিগত শিক্ষাও নিতে হয়। এই শিক্ষা চলে আজীবন ও আ-মৃত্যু।

বাংলা ভাষা - আমাদের মাতৃভাষা এবং এই ভাষাও আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গী,

www.pathagar.com

আত্মপ্রকাশ ও ভাব-বিনিময়ের মাধ্যম। বাংলাদেশে আমাদের জন্মসূত্রে এবং বাংলা ভাষাভাষী পরিবারে, পরিবেশে আর বাংলা ভাষাভাষী মাতৃ বা ধাত্রীর কোলে মানুষ হওয়ার তথা লালিত-পালিত হওয়ার দরুনই ঐতিহ্যসূত্রে বাংলা আমাদের মাতৃভাষা এবং আমাদের অর্থাৎ এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাংলা ভাষাভাষী তাদের মাতৃভাষা বাংলা। উল্লেখ্য, বাংলা ভাষার রয়েছে হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং আমাদের মাতৃভাষা বাংলা পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ও শ্রেষ্ঠ ভাষা, এই ভাষায় রয়েছে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত সাহিত্য। হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অধিকারী বাংলা সাহিত্য বৃটিশ পরাধীনতার যুগে বহু প্রতিভাবান ও সৃষ্টিধর্মী লেখকের অবদানের ফলে এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম রূপকার রবীন্দ্রনাথের ১৯১৩ সালে নোবেল সাহিত্য পুরস্কার লাভের দরুন বৃটিশ আমলে এবং পরবর্তীকালে বহু প্রতিভাবান ও সৃজনধর্মী লেখকের অবদানে তাদের রচনা ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হওয়ার দরুন ও বাংলা সহিত্য আন্তর্জাতিক পরিচিতি এবং বিশ্ব স্বীকৃতিও লাভ করে। কিন্তু এ সত্ত্বেও, হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অধিকারী বাংলা ভাষা ১৯৫২ সালের আগে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা ও স্বীকৃতি লাভ করেনি। প্রাচীন যুগে, মধ্যযুগে, সেন, পাল, পাঠান, মোঘল আমলে এবং বৃটিশ যুগেও আমাদের মাতৃভাষা বাংলা কখনো রাষ্ট্রীয় ভাষার মার্যাদায় অভিষিক্ত ও আসীন ছিল না। উচ্চশিক্ষার মাধ্যমও ছিল না বাংলা ভাষা। মুসলমান শাসনামলে মোঘল এবং পাঠানদের শাসনকালে রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা হলেও, এই ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করেনি। হিন্দু শাসনামলে পাল ও সেন শাসকদের যুগে সংস্কৃতি রাষ্ট্রভাষা-এবং মোঘল ও পাঠান আমলে রাষ্ট্রভাষা ছিল ফারসী এবং বৃটিশ যুগে ইংরেজী।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা পাকিস্তান শাসনামলে ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলন ও ভাষা-শহীদদের – বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার এবং আরও বহু নাম না-জানা শহীদদের আত্মদানের ফলে, এক পর্যায়ে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাও পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করে। ১৯৪৮ সাল থেকে যে ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলনের শুরু, ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুআরি শহীদদের আত্মদানের মাধ্যমেই অর্জিত হয় মাতৃভাষা বাংলার এই মর্যাদা ও স্বীকৃতি । পশ্চিমা অবাঙ্গালী শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ কালের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে তিরিশ লাখ শহীদের আত্মদানের বিনিময়ে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর, আমাদের মাতৃভাষা

www.pathagar.com

বাংলা একাধারে মাতৃভাষা, জাতীয় ভাষা ও রাষ্ট্রীয় ভাষা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাসে বাংলা ভাষার এই মর্যাদা ও স্বীকৃতি অর্জন ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের আর স্বাধীনতা অর্জনেরই ফল। এ সত্য অনস্বীকার্য যে, মূলত আমাদের মাতৃভাষা বাংলার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবীতে আন্দোলন গঠিত হলেও ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এবং একুশের চেতনা এ-দেশের মানুষের স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধ, স্বাধিকার চেতনা, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্নকেই জাগিয়ে তোলে, তার প্রতীকে পরিণত হয়।

রাজনৈতিক সচেতনতা, স্বাধিকারবোধ ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্পৃহা জাগ্রত হওয়ার দরুনই অব্যাহত সংগ্রামের ফলে এবং পরিণামে এ-দেশের মানুষ রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে অগণিত শহীদের আত্মদানের মাধ্যমে এ দেশকে পশ্চিমা শাসক-শোষকদের হাত থেকে মুক্ত করে প্রতিষ্ঠিত করেছে নিজেদের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বস্তুতঃ উনিশ শ' বায়ান্ন সাল থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামের যে ইতিহাসের সূচনা, একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয় অর্জন তারই গৌরবময় পরিণতি।

স্বদেশপ্রেম ও মাতৃভাষা প্রীতি মানুষের এক মজ্জাগত প্রবণতা। নিতান্ত ছিন্নমূল ও উৎকেন্দ্রিক না হলে কেউ স্বদেশপ্রেমবর্জিত এবং মাতৃভাষার প্রতি বৈরী প্রবণতার অধিকারী হতে পারে না। মানুষের মনে স্বদেশচেতনা ও স্বদেশপ্রেম উৎসারণে ভাষা এক বড় অবলম্বন ও উৎস। মাতৃভাষাপ্রীতি থেকে মানুষের মনে স্বদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধ জন্মায়। ভাষা এবং সংস্কৃতি, স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতি, জাতীয় চেতনা এবং জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতেও অন্যতম প্রধান উপাদান নিয়ে। এ দেশের মানুষের মাতৃভাষা প্রীতি, তার স্বদেশ চেতনা ও স্বদেশ-প্রেমের এবং জাতীয়তাবোধের উৎসারণে বড় উৎস ও অবলম্বন হয়েছে। ইতিহাসের পাতায় আছে তার পরিচয়। কিন্তু মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালে ও ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনকালে এ-দেশের মানুষের যে সংগ্রাম ও আত্মদান, তা বাংলা ভাষার হাজার বছরের ইতিহাসে শুধু ঐতিহাসিক ঘটনাই নয়, অনন্য ঘটনাও। পৃথিবীর সবদেশেই মাতৃভাষার প্রতি মানুষের গভীর প্রীতি রয়েছে। আছে মানুষের স্বদেশপ্রেম আর স্বজাতিপ্রীতি। কিন্তু আমাদের দেশের মতো মাতৃভাষার জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও আত্মদানের ঐতিহাসিক ও অবিস্মরণীয় ঘটনা আর কোথাও ঘটেছে কিনা, তা ঐতিহাসিকরাই বলতে পারেন। ভাষা-আন্দোলন তথা বায়ান্নর অমর একুশে

www.pathagar.com

ভাষা-শহীদের আত্মদানের পথ ধরে পরবর্তীকালে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন ও সংগ্রামের যে সূচনা এবং একাত্তরে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা অর্জন, মাতৃভাষাপ্রীতি ও স্বদেশ প্রেম থেকে উৎসারিত সংগ্রামে এ-ধরনের সাফল্য অন্য কোথাও অর্জিত হয়েছে কিনা, তা-ও ঐতিহাসিকরাই ভালো বলতে পারবেন।

আমাদের ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলনের এবং অমর একুশের এমন অসাধারণ গুরুত্ব অর্জনের কারণেই একুশে ফেব্রুআরি আমাদের অনিমেষে প্রেরণার উৎস, এবং অধিকার আদায় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতীক। অমর একুশে যেমন আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ও স্বাধীনতা অর্জনে ঐতিহাসিক ও অনুপ্রেরণা সঞ্চারী ভূমিকা পালন ও অবদান রেখেছে, তেমনি স্বাধীনতা উত্তরকালে আমাদের এই স্বাধীন সার্বভৌম দেশে সব ধরনের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে এবং স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামেও অমর একুশে এক বড় প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। বস্তুত আমাদের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন ও অমর একুশের এমন বহুমাত্রিক ভূমিকা ও গুরুত্বের কারণেই এবং মাতৃভাষা প্রীতি ও স্বদেশপ্রেম থেকে তা উৎসারিত বলেই, অমর একুশে ফেব্রুআরি পৃথিবীর সব মানুষের মাতৃভাষাপ্রীতির এবং তা থেকে শক্তি অর্জনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। ইউনেস্কো আমাদের ভাষা শহীদ দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়ে শুধু মাতৃভাষার জন্যে আমাদের সংগ্রাম এবং আত্মদানেরই স্বীকৃতি দেয়নি। মাতৃভাষা-আন্দোলন থেকে এবং অমর একুশের শহীদদের আত্মদান থেকে উৎসারিত স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনতা অর্জনকেও মর্যাদা দিয়েছে। একালে আমাদের দেশের এবং অন্যান্য দেশের বাংলাভাষী লক্ষ লক্ষ মানুষের বসবাস বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। ফলে এখন বাংলা ভাষার পরিচয় বলতে গেলে বিশ্বময় মাতৃভাষা যে মানুষের অদ্বিতীয় সত্তার মতো, এবং মাতৃভাষাপ্রীতি আর এই ভাষার ব্যাপক চর্চা, উন্নয়ন ও অগ্রগতি আর মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার, সাহিত্যসৃষ্টি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও সংস্কৃতি সাধনার মধ্যেই যে উন্নতি ও সমৃদ্ধি নিহিত, এ সত্যও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত। পৃথিবীর সব ছোট-বড় দেশ, জাতি ও জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা (তা দেশীয়ও জাতীয় ভাষা হোক, কিংবা আঞ্চলিক ভাষাই হোক) যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা লাভ করুক, নানাভাবে বিকশিত হোক, ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এই আমাদের কাম্য।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জাতীয় চেতনা পরিষদ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ক) দল-মত নির্বিশেষে সব মানুষের কাছে ইসলামের সঠিক ধারণা তুলে ধরা এবং দায়িত্ব পালনে সচেতন করা।

(খ) দেশ ও জনগণের সার্বিক কল্যাণ ও শান্তির জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

(গ) অভিন্ন চেতনায় লালিত জনগণ ও সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহযোগিতা করা।

(ঘ) সম্প্রসারণবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে দেশের সম্পদ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং মর্যাদা সমুন্নত রাখতে জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা।

(ঙ) অপসংস্কৃতির প্রসার ও আধিপত্যবাদী শক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আগ্রাসন রোধ।

কর্মসূচী

(ক) দেশের জনগণ বিশেষ করে কবি, লেখক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, আইনজীবীসহ সকল পেশাজীবীদের ইসলামের সঠিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে লেখনী, বক্তব্য, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, মতবিনিময় এবং গোলটেবিল বৈঠকসহ প্রয়োজনে সমাবেশের আয়োজন করা।

(খ) জাতীয় সংকট ও জনগণের সমস্যা চিহ্নিত করে তা নিরসনে সঠিক পথ নির্দেশ দেয়া।

(গ) অভিন্ন চেতনায় লালিত জনগোষ্ঠি, সংগঠন ও দেশসমূহের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য এবং পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করা এবং একই কর্মসূচী গ্রহণে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করা।

(ঘ) ইসলামের সঠিক চেতনাকে গণমাধ্যম বিশেষ করে পত্র-পত্রিকা এবং রেডিও টিভির মাধ্যমে জনগণের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করা।

৪৯৮/৪ বাগানবাড়ি, মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭, ফোন ঃ ৯৩৩৮০৮৯